

শিক্ষা ও সমাজ •



• মোহুলেদ আহমদ

শিক্ষা ও সমাজ

(সমালোচনা ও গঠনমূলক প্রবন্ধ)

মোহাম্মদ আহমদ

পাকিস্তান শিক্ষা ও সংস্কৃতি মিশন
৩৪ নং শ্রীশ্রীদাস রোড, ঢাকা

প্রকাশক :

শেখ মনিরুজ্জামান

পাকিস্তান শিক্ষা ও সংস্কৃতি মিশনের পক্ষে

৩৪ নং শ্রীশ্রীদাস লেন, ঢাকা।

প্রথম প্রকাশ :

আজাদী দিবস

১৯৫২ সাল।

দাম : ছয় আনা

(সমুদয় লভ্যাংশ পাকিস্তান শিক্ষা

ও সংস্কৃতি মিশনের প্রাপ্য)

মুদ্রাকর :

এম, রাজিয়ুল্লাহ

রেনেসাঁস প্রিন্টার্স

১০, নর্থব্রুকহল রোড, ঢাকা।

ସନ୍ଥ ୨, କୋ, ୨୩, ପୁରୁଷ ଶୈଳାଧର

୩

ବୋନ ଜାହାଜାଆ ଆମ୍ଭକୁକେ—

শিক্ষা ও সমাজ সম্বন্ধে যা কিছু প্রয়োজন তার একটু ইংগিত দিয়েই এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধটী পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা হোলো। সবদিকে নজর রেখে নিজের স্বাধীন মতামত যথাসাধ্য ব্যক্ত ক'রবার চেষ্টা ক'রেছি মাত্র। শিক্ষিত ও গুণী সমাজে পুস্তিকাখানি আদৃত হ'লে অদূর ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে সবিস্তার অনেক কিছু বলবার ও ক'রবার আশা রইলো।

সরকারী ও বেসরকারী মহল থেকে শিক্ষা ও সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে যে সব প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনা করা হ'য়েছে তাতে আমি বৃহত্তর কিছুর সন্ধান পাইনি। আমার মতামত ইতিপূর্বেও অনেক সংশ্লিষ্ট মহলের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের নিকট অকপটে ব্যক্ত ক'রেছি। তাঁরা আমার সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই একমত হ'য়েছেন; কিন্তু কর্মক্ষেত্রে তাঁদের অক্ষমতাই প্রকাশ ক'রেছেন।

সমস্যার সমাধান নির্ভর করে সাম্যনীতি, অর্থনীতি ও সুবিচারের আদর্শ অকপটভাবে গ্রহণের ওপর এবং সেই আদর্শ প্রচারের জন্ত চাই একদল নিঃস্বার্থ কর্মী বা “মিশনারী”।

(পৃষ্ঠা)

শিক্ষা ও সমাজ	৫
প্রচলিত শিক্ষা প্রথা	...	৭
শিক্ষার উদ্দেশ্য	১১
অন্তরায়	১৩
প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা	...	১৬
ইছলাম ও ইছলামী সমাজ	১৭
সংস্কার ও গঠন	২১
পরিকল্পনা	২৪

শিক্ষা ও সমাজ

একটা বৃহত্তর জাতি গঠনের কথা আজকাল কমবেশী অনেকেই চিন্তা করে থাকেন একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে ; কিন্তু সবারই চিন্তাধারা হয়ত একই পথে নির্দেশিত নয় । কেই ভাবেন রাজনৈতিক পরিবর্তন বা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠবে আমাদের স্বপ্ন-লোকের এক বিরাট ও সুমহান্ জাতি । আবার কেউ ভাবেন দেশের আর্থিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে পারলেই তাঁদের সব সাধ, সব আশা সফল হবে । কেউ ভাবেন রাশিয়াকে, কেউ ভাবেন ইংল্যান্ড, কেউ বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আবার কেউ হয়ত অতীতের আরব দেশকে । এঁদের কারও চিন্তাধারাকেই একেবারে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয় । তবে যাঁরা আরও গভীরভাবে এসব চিন্তা করেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন যে সমাজ গঠন ব্যতিরেকে জাতি গঠন সম্ভব নয় আর সমাজ গঠনের জন্য চাই উপযুক্ত শিক্ষা ।

সমস্যাটার সমাধান এখানেই হলো না । এখন প্রশ্ন দাঁড়ায় — শিক্ষার ব্যবস্থা ক'রবে কে ? যদি বলা হয় দেশের সরকার, তখন আবার প্রশ্ন উঠবে সমাজই যদি আদর্শ না হয় তবে আদর্শ সরকার আশা করা যায় কিরূপে এবং সরকারই যদি আদর্শ না হয় তবে জাতিগঠনের এই বিরাট দায়িত্বভার নেবে কে ? এইভাবে যুক্তি ও প্রশ্ন দিয়ে সমস্যাটা ক্রমশঃ জটিল হ'য়ে

ওঠে সন্দেহ নেই ; কিন্তু সমাধান একটা চাই-ই যাতে আমাদের সকলেরই চিন্তা সার্থক হয় অর্থাৎ আমরা একটা বৃহত্তর জাতি গ'ড়ে তুলতে পারি ।

জাতি গঠনের ব্যাপারে জাতির সরকারের দায়িত্ব কি এবং দেশের জনগণের দায়িত্ব কি এর কোন সীমারেখা টেনে দেওয়া সম্ভব কি না সে কথা বলা খুবই শক্ত । কোথাও দেখা যায় সরকারই জনগণকে পরিচালনা করেন আবার কোথাও দেশের জনগণই সরকারকে চালিয়ে নিতে পারেন । “চালিয়ে নেওয়া” বা “পরিচালিত করা” বলতে শক্তির কথাই এসে পড়ে । “Power” অর্থাৎ রাজনৈতিক শক্তি ছাড়া নাকি জাতি গঠন সম্ভব নয়—যেমন কামাল আতাতুর্ক গ'ড়েছিলেন তুর্কী জাতিকে । সম্প্রতি মিশরে ও ইরানে যে ব্যাপারটা হ'লো সেটাও আমাদের চিন্তার বিষয় ।

এসব ছাড়া আরও একটা বড় প্রশ্ন রয়েছে । সেটাকে আমরা “আত্ম-জিজ্ঞাসা” বা “আত্ম-সমালোচনা” ব'লতে পারি । সেটা ব্যক্তিগত, জাতিগত এবং সামাজিকও বটে । আমাদের “আত্ম-সমালোচনার” বড় কথা—আমরা সত্যিই একটা জাতি কি না ? যদি আমরা তাই-ই হই তবে জাতি গঠনের প্রশ্ন ওঠে কেন ? আমাদের সমাজ আদর্শ স্থানীয় কি না ? যদি না হয় তবে গলদ কোথায় ? কি ভাবে সমাজসংস্কার সম্ভব ।

অনেকের ধারণা, সমাজ ও জাতি গ'ড়ে উঠবে উপরের দিক

শিক্ষা ও সমাজ

থেকে। কারও ধারণা ঠিক তার বিপরীত। আবার কেউ মনে করেন উপরের আর নীচের যখন সমন্বয় হবে তখন আপনা থেকেই সমাজ গ'ড়ে উঠবে, জাতিও গ'ড়ে উঠবে। বিপ্লবীরা বলেন শক্তি হাতে পেলেই আদর্শ জাতি তাঁরাই গ'ড়বেন। অত্যাপক্ষে ধর্মভীরু পুরোহিতরা বলেন ধর্মই শক্তির মূল কেন্দ্র অর্থাৎ শান্তির মধ্য দিয়েই গঠন কার্য সম্ভব হবে।

কোন পক্ষের কোন ধারণাকে ভ্রান্ত বলাও যেমন বিপদ, অভ্রান্ত বলা ঠিক তেমনি বিপদ। দার্শনিক ও জ্ঞানীর কথায় বলা যায়—সব তরফের সব কথায় কান না দিয়ে সত্যিকার জিনিষটাকে পর্যবেক্ষণ ক'রে কাজে নেমে পড় এবং তোমার সাথে যদি কেউ আসতে চায় তাকেও সাথে নিয়ে নাও। কিন্তু এখানেও আর এক মুশ্কিল যে দার্শনিকও কাজে নামেন না, জ্ঞানীরাও কাজে নামেন না। তারও কারণ রয়েছে। এসব দ্বন্দ্বের মূল কারণ আমাদের শিক্ষার শ্রেণী বিভাগ অর্থাৎ অসম্পূর্ণ শিক্ষা। যে শিক্ষা মানুষকে সম্পূর্ণ মানুষ ক'রে গ'ড়ে তোলে না, যে শিক্ষা কেবলমাত্র অপরকে উপদেশ দেবার প্রবৃত্তিকে বাড়িয়ে দেয় সে শিক্ষা দ্বারা আমাদের জাতি ও সমাজ কোনদিন গ'ড়ে উঠবে না। সবাই নেতা হ'তে চায় কিন্তু কেউ কর্মী হ'তে চায় না।

প্রচলিত শিক্ষা প্রথা

আমাদের মনে রাখতে হবে, শিক্ষাই গ'ড়ে তোলে সত্যিকার মানুষ

শিক্ষা ও সমাজ

আর মানুষই গ'ড়ে তোলে আদর্শ সমাজ ও বৃহত্তর জাতি। কিন্তু যদি কোন জাতির জীবনে শিক্ষা যথেষ্ট পরিমাণ সফল-প্রসূ না হয় অর্থাৎ সেই জাতিকে অপর কোন জাতির প্রতি একান্ত নির্ভরশীল ক'রে তোলে তবে বুঝতে হবে, সে শিক্ষা অসম্পূর্ণ ও বিপরীত ধর্মী। শিক্ষাকে দোষ দেওয়া সম্ভবপর নয় কারণ শিক্ষাকে মানুষ বা যন্ত্রের সাথে তুলনা করা যায় না। এজন্য দায়ী দেশের শিক্ষক সমাজ। শিক্ষকরাই প্রকৃতপক্ষে জাতির পিতা। পিতা যদি তাঁর পুত্রকে শিশুকাল থেকে অবহেলা ক'রে আসেন, তাকে প্রকৃত শিক্ষাদানে অক্ষম হন তবে সেজন্য পুত্র-দায়ী নয়। পুত্রের দায়িত্ব যঁার ওপরে ছিল সেই প্রতি-পালক পিতাকেই দোষী করা স্বাভাবিক। হ'তে পারে এই পিতা-রূপী শিক্ষক-সমাজের ওপর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বিद्यমান ছিল এবং প্রয়োজন বোধে এখনও মাঝে মাঝে চালানো হ'য়ে থাকে। তাই ব'লে এটাকে একটা কৈফিয়ত ব'লে ধরা যায় না। কোন একজন শিক্ষক ২১ দিন না খেয়ে পাঠশালায় আসুন অথবা তার পাঠশালার সম্মুখে প্রহরী নিযুক্ত করা হউক তাতে সেই শিক্ষকের পক্ষে শিক্ষার পবিত্রতা নষ্ট করা ঠিক হবে না। সব প্রতিকূল অবস্থাতে তিনি যদি শিক্ষকতা করতে বাধ্য হন তবে ছাত্রদের সম্মুখে এসে তাঁকে বলতে হবে যে তাঁর ছাত্রেরা আর পাঁচ জনের মত মানুষ না হ'য়ে সত্যিকার মানুষ হ'য়ে গ'ড়ে উঠুক। সাধারণ হাত-পা বিশিষ্ট মানুষ আর

শিক্ষা ও সমাজ

প্রতিভাশালী মানুষদের পার্থক্য রয়েছে একথা ছাত্রদের বুঝিয়ে দিতে হবে। তিনি যদি তা না পারেন তবে তাঁকে শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে অগ্নিপথ বেছে নিতে হবে। কারণ সরকারী অফিসের মামুলী “কলম-পেশা” আর শিক্ষকতা করা এক কথা নয়।

প্রকৃত কথা, আমাদের দেশের শিক্ষকদের প্রকৃত শিক্ষা সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। তাঁরা গতানুগতিক পন্থায় “সস্তা-কর্তব্য” করেই নিশ্চিন্ত। স্বাধীন চিন্তা করবার মত শিক্ষক আমাদের দেশে বোধহয় একেবারেই নাই। যদি বলা হয় আছে এবং প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা ঠিকই আছে তবে আমাদের আশানুরূপ একটি জাতি কেন গ’ড়ে উঠছে না? হয়ত কেউ বলতে চাইবেন—জাতি ঠিকই গ’ড়ে উঠছে তবে অগ্নোর বুঝতে পারছেন না। জাতি গ’ড়ে উঠছে কি ভেঙে যাচ্ছে এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে তর্ক না করাই ভাল। জাতির স্বাস্থ্য-পরীক্ষক ডাক্তার আসল কথা নিশ্চয়ই জানেন। তবে তিনিও নাকি প্রেসক্রিপশন মত ঔষধ পান না।

প্রকৃত শিক্ষা কি একথা বলা বাস্তব ক্ষেত্রে হয়ত একটা সমস্যা, তবে একথা বলা যায়, যে শিক্ষা মানুষ না গ’ড়ে কতকগুলি কলের পুতুল গ’ড়ে তোলে সে শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা নয়। শিক্ষা বলতে আমাদের ধারণাও অতি সংকীর্ণ। শিক্ষা বলতে সাধারণতঃ লোকে জানে বই পড়া, বই লেখা আর ইংরেজী হরফের দুই একটা ডিগ্রী নেওয়া। যাঁর ডিগ্রী যত

শিক্ষা ও সমাজ

বড় তিনিই তত বেশী শিক্ষিত। এঁদের মধ্যে আবার যদি কেউ একটা বিদেশী ডিগ্রী নিয়ে আসেন তবে তিনিই হ'লেন জাতির আদর্শ ত্রাণকর্তা। তাঁদের মতে, যাঁদের প্রতিভা আছে কেবলমাত্র তাঁদেরই ডিগ্রী আছে এবং যাঁদের ডিগ্রী আছে তাঁদের প্রতিভাও আছে। এর বেশী চিন্তা করতে তাঁরা আদপেই রাজী নন এবং যাঁরা চিন্তা করেন তাঁরা জাতির ত্রাণকর্তাদের কাছে অতি নগণ্য।

দেশী বা বিদেশী ডিগ্রী লাভ অথায় কাজ বা অপ্রয়োজনীয় কাজ একথা বলা ঠিক না, তবে ডিগ্রী দিয়ে প্রতিভার বিচার করাও মারাত্মক ভুল। এর নজীর সব দেশেই আছে। যাঁরা সত্যিকার প্রতিভাবান মানুষ, যাঁরা দেশ ও জাতি গঠনের চিন্তা করেন, যাঁরা সমাজ ও জাতির জন্য যথেষ্ট স্বার্থ ত্যাগ ক'রে দুঃখ ও দারিদ্র্যকে বরণ করেন তাঁদের ডিগ্রী থাকতেও পারে অথবা নাও পারে।

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষার আদর্শ যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়ে পড়েছে এবং তার সংস্কারও যে অতি প্রয়োজনীয় একথা বহুবার বহু সভা সমিতিতে এমন কি সরকারী ইস্তাহারেও আলোচিত হ'য়েছে। এসব আলোচনা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই ; কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন সৃষ্ট ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। যা কিছু হ'য়েছে তা হয়ত সরকারী দপ্তরেই হ'য়েছে কারণ জাতিকে শিক্ষিত ক'রে গ'ড়ে তোলার দায়িত্ব সরকারের।

শিক্ষা ও সমাজ

সরকারী কর্মচারীরা যদি এটাকে তাঁদের একচেটিয়া দায়িত্ব বলে মেনে নেন তবে মনে হয় সেটা তাঁদের ভুল হবে। কারণ দেশের সবগুলি প্রতিভাবান মানুষই সরকারী কর্মচারী নহেন। একথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, প্রতিভা স্রষ্টার প্রদত্ত এক মহান্ দান এবং এই প্রতিভা বিকাশের সুযোগ ও সুবিধা ক'রে দেওয়াই সরকারী কর্মচারীদের সর্বাপেক্ষা বড় কর্তব্য। প্রতিভা-শালী, ডিগ্রীধারী ও শিক্ষকতায় পারদর্শী ব্যক্তিদের নিয়ে যদি শিক্ষানীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের কোন প্রচেষ্টা হয় তবে সেটা সাফল্যমণ্ডিত হবে আশা করা যায়।

শিক্ষার উদ্দেশ্য

শিক্ষার প্রথম উদ্দেশ্য মানবতার বিকাশ সাধন অর্থাৎ মানবের স্বভাবজাত গুণাবলীর সাথে ছাত্রের পরিচয় ক'রে দেওয়া আর তদনুসারে তাকে গ'ড়ে উঠতে সাহায্য করা। যখন কিছু সংখ্যক আদর্শ মানুষ সৃষ্টি হবে তখন তারাই গ'ড়ে তুলবে একটা আদর্শ সমাজ। এই সমাজে থাকবে ঐক্যবোধ এবং একই মহৎ উদ্দেশ্য। সামাজিক ঐক্যবোধই আস্তে আস্তে জাতীয় জীবনের ঐক্যবোধকে পরিপুষ্ট ও পরিপক্ব ক'রে তুলবে। যার যা খুশী ক'রবে আর যা খুশী পরবে এসব ঐক্যবোধের পরিচায়ক নয়। আমরা পাকিস্তানীরা একটা জাতি; কিন্তু আমাদের কেউ প'রবেন কোই প্যান্ট, কেউ প'রবেন লম্বা কুর্তা আবার কেউ প'রবেন লুঙ্গি। আমাদের ছাত্রেরা কেউ

শিক্ষা ও সমাজ

প'ড়বে ইংরেজী, কেউ আরবী, কেউ বাংলা আবার কেউ প'ড়বে উর্দু। এই পড়া ও পরা (পরিধান) এর মধ্য দিয়েই সৃষ্টি হয় অনৈক্য। সভ্য জগতের সবারই একটা জাতীয় পোষাক র'য়েছে, কিন্তু আমাদের জাতীয় পোষাক শুধু বৎসরের কয়েকটা বিশিষ্ট দিনের জন্যই নির্ধারিত। পৃথিবীর সব দেশেই প্রাথমিক শিক্ষা (Basic Education) একই আদর্শমুখী আর আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা বিভিন্ন আদর্শমুখী হবে কেন? যদি জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি ক'রতে হয় তবে শিক্ষার আদর্শকে একমুখী করতে হবে এবং সবাইকে একই ধরনের পোষাক প'রতে হবে। সেটা যে কোন আদর্শই হোক আর যে কোন পোষাকই হোক না কেন। এ বিষয়ে অসীম তর্কের অবতারণা হ'তে পারে, নানাবিধ অসুবিধার কথাও উঠতে পারে; কিন্তু আইন ও নীতি সকলের জন্যই সমপ্রযুক্ত হবে। পৃথিবীর অত্যাঁচ দেশে যদি একই নিয়ম চ'লতে পারে তবে আমাদের দেশে স্বতন্ত্র হ'লেও একটীমাত্র নিয়ম কেন চ'লতে পারে না এর কোন কৈফিয়ত নেই। কথা উঠতে পারে, চাষীদের যে পোষাক প'রে চাষ ক'রতে হয় সে পোষাক অফিস আদালতে চলে না। সেটা ঠিক কথা; কিন্তু চাষীরা ত দিন-রাত সর্ব্বদাই চাষ করে না। চাষ কাজের শেষে অথ পাঁচজনের মত একই পোষাক প'রে রাস্তায় কেন সে বেরুতে পারবে না? ঐক্যনীতিমূলক পোষাক যাই-ই হোক না কেন তা একই ধরনের হবে সব শ্রেণীর লোকদের জন্য।

শিক্ষা ও সমাজ

শিক্ষা সম্বন্ধেও একই নিয়ম চ'লবে। যার যা খুশী প'ড়তে পারবে না। যদি ইংরেজী শিখতে হয় সবাই শিখ'বে আর যদি আরবী শিখতে হয় তাও সবাই শিখ'বে। জীবনের একটা বিশেষ স্তর পর্য্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা (Basic Education) একই পর্য্যায়ের হওয়া প্রয়োজন। স্কুল আর মন্তব পৃথক থাকবে না। ছ'টীকে ভেঙে এক ক'রতে হবে। তারপর প্রাথমিক স্তর যখন পার হ'য়ে যাবে তখন আপন আপন প্রতিভা, যোগ্যতা ও প্রয়োজন অনুসারে ছাত্রেরা বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হ'য়ে যেতে পারে। যে ছাত্র ধর্মচর্চা ক'রবে বিশ্ববিদ্যালয়েই সে তাই প'ড়বে, যে ছাত্র ডাক্তার হবে সে ডাক্তারীই প'ড়বে ইত্যাদি। পরবর্তী জীবনে যখন ছাত্রেরা বিভক্ত হ'য়ে প'ড়বে তখন যাতে তাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধী ক্ষতিকর মতবাদের সৃষ্টি হতে না পারে সেজন্য প্রাথমিক শিক্ষা পদ্ধতিকে সূচিন্তিত পরিকল্পনার ওপর ভিত্তি ক'রে গ'ড়ে তুলতে হবে। ধর্মের অনুশাসন পালন সব স্তরের সব ছাত্রের জন্যই বাধ্যতামূলক হবে।

অন্তরায়

জাতি গঠনের অর্থাৎ দেশের শিক্ষানীতির আমূল সংস্কার সাধনের প্রধান অন্তরায় দেশের প্রচলিত বৈষম্যমূলক আর্থিক ব্যবস্থা। দেশের ধনী সম্প্রদায় তাঁদের সঞ্চিত অর্থ দরিদ্র সম্প্রদায়ের স্বার্থের অনুকূলে বিলিয়ে দিতে কখনই রাজী হবেন না একথা সত্য। আর যদি রাজীও হন তবে সেটা তাঁদের

শিক্ষা ও সমাজ

ভয়ানক অন্যায্য হবে। কারণ তার ফলে দেশময় একটি মাত্র শ্রেণীই বিরাজ ক'রবে আর সেটা হবে একটা বিরাট দরিদ্র মানব শ্রেণী ; কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। ধনী ও দরিদ্র উভয় শ্রেণীকেই বাঁচিয়ে রাখা যখন “আল্লার” ইচ্ছা তখন সেটা থাকাই ভাল। তাই অন্য পথেই এর সমাধান হওয়া প্রয়োজন।

দেশের অর্থ সমানভাবে সকলকে ভাগ ক'রে দেওয়া সম্ভব নয়। কোন দেশের কোন কালের কোন জাতির মাঝে এরূপ সম্ভব হয়নি আর তা কেউ আশাও করে না। তবে একটা জিনিষ সবাই চায় — প্রত্যেক মানুষকে অর্থোপার্জনের সমান সুযোগ প্রদান করা এবং সরকারী খরচে সবাইকে উপযুক্ত কার্যকরী শিক্ষা দেওয়া। যদি তা না হয় তবে গরীবের ছেলেরা কোন দিনই বড় হবে না। শিক্ষা জিনিষটা চিরকাল ধনী সম্প্রদায়ের বিলাসের সামগ্রী হ'য়েই থাকবে।

আমাদের রাষ্ট্র ইছলামী সাম্য নীতির উপর গ'ড়ে উঠবে এরূপ প্রতিশ্রুতি আমরা পেয়েছি এবং এখনও পেয়ে থাকি। সাম্যনীতির গোড়ার কথা—সাম্যমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা। এজন্য অন্ততঃ প্রাথমিক পর্যায়ের (Basic Education) সকল শিক্ষার দায়িত্বভার সরকারকে গ্রহণ ক'রতে হবে। এই শিক্ষার সীমা ও নীতি নির্ধারণ ক'রবেন অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই। এর মাঝে বিদেশী বেইমানী প্রভাব যেন স্থান না পায় সে বিষয়ে সকলকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সরকারী কর্মচারীরা হয়ত কৈফিয়ত দেবেন

শিক্ষা ও সমাজ

যে রাষ্ট্রের শিক্ষাখাতে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয় তাতে এমন একটা কিছু করা সম্ভব নয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে রাষ্ট্র সকলের এবং অধিকার সকলেরই সমান। পৃথিবীর সব দেশেই অর্থাৎ মার্কিন, রাশিয়া, ইংল্যান্ড, জার্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে যদি রাষ্ট্রের খরচে জনসাধারণের শিক্ষা ব্যবস্থা চ'লতে পারে তবে ইচ্ছামূলী রাষ্ট্র পাকিস্তানে কেন চ'লবে না? প্রারম্ভে সব দেশেই অর্থ সমস্যার প্রশ্ন উঠেছিল এবং তার সমাধানও হ'য়েছিল। তাই পাকিস্তানেও তা সম্ভব হবে। এর জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হবে তার দ্বিগুণ, চতুর্গুণ অর্থ সংগৃহীত হ'তে পারে সাধারণের উপর অতিরিক্ত কর ধার্য না করেও। কৈফিয়ত যে অর্থের নয় একথা এখন অনেকেই বুঝতে পেরেছেন। মনে হয় প্রকৃত কৈফিয়ত দেশের নেতৃবৃন্দের অনুদার মনোভাবের। দেশের ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থের দিকে নজর রেখে এই অনুদার মনোভাবকে সম্পূর্ণ বর্জন ক'রতে না পারলে অদূর ভবিষ্যতে দেশের অমঙ্গল হবে এ বিষয়ে অনেকেই নিঃসন্দেহ এবং ছুনিয়ার ইতিহাসে তার অনেক নজীর র'য়েছে।

অনেকের মতে শিক্ষক সমস্যাও নাকি শিক্ষা পরিকল্পনার আর একটা অন্তরায়। কথাটা প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় শিক্ষক নেই। তারপর দেখা যায় শিক্ষকতা করবার মত লোক যথেষ্ট আছেন তবে তাঁরা শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে সব অফিস আদালতের চাপরাশির কাজও নিতে শুরু ক'রেছেন। কারণ আর্থিক

সমস্যাটাই তাঁদের কাছে ভীষণতম ব'লে প্রতীয়মান হ'য়েছে। অনেকেই জানেন দেশে শিক্ষিত বেকার লোকের অভাব নেই অথচ তারা গ্রামের পাঠশালায় শিক্ষকতা ক'রতে চান না। পাঠশালার শিক্ষকতা আজ এমন এক পর্যায়ে নেমে এসেছে যে সেটা যেন অপমানকর একটা কিছু। আমাদের সমাজে অর্থনৈতিক শ্রেণী-বিভাগ যে রূপ ভীষণভাবে দেখা দিয়েছে তাতে মনে হয় অর্থই “ধর্মের” ও “কর্তব্যের” স্থান অধিকার ক'রে ব'সে গেছে।

প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা

আমাদের দেশে সৃষ্ট কোন সমাজ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে ব'লে মনে হয় না। আমাদের সমাজ মোটামুটি ধর্মবিশ্বাসের ওপর ভিত্তি ক'রে গ'ড়ে উঠেছিল ; কিন্তু বর্তমানে সমাজ থেকে ধর্ম স'রে গিয়ে স্থান দিয়েছে কতকগুলি কুসংস্কারকে। আসলে যেখানে ধর্ম নেই সেইখানেই ধর্মের অহঙ্কার ও নির্মম অত্যাচার। ধর্মের যে মহান্ আদর্শ এক কালে মানুষকে উদ্ধুদ্ধ ক'রেছিল সার্বজনীন উন্নতির দিকে, সে আদর্শ এখন বিত্ত ও প্রতিপত্তি-শালী ব্যক্তিদের হস্তে নির্মমভাবে নিষ্পেষিত। ধর্মের আলোকে যে মানুষের হৃদয় একদিন উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছিল সে মানুষ আজ হৃদয়কে অন্ধকারে নির্মজ্জিত ক'রে বাইরে ধর্মের আবরণ নিয়েই ভড়ং ক'রে বেড়াতে দ্বিধাবোধ করে না। ধর্মের নির্বাসন ঘটেছে কতকটা রাজনৈতিক কারণে আর কতকটা আর্থিক কারণে। অন্যকথায় বলা যায় যে শক্তির কাছে ধর্ম আজ পরাজিত।

শিক্ষা ও সমাজ

শক্তিশালী মানুষ কোথাও প্রত্যক্ষভাবে ধর্মকে করতলগত ক'রে ফেলেছে আর কোথাও ক'রেছে পরোক্ষভাবে।

বর্তমান সমাজের প্রচলিত ব্যবস্থাগুলির মধ্যে কোনটী ধর্মীয় আর কোনটী ধর্মীয় নয়, সে বিচার ক'রতে পারে উদার শিক্ষা ও উন্মুক্ত জ্ঞান। আজ আমরা এমনি একটি অবস্থার মধ্যে এসে প'ড়েছি যেখানে ধর্মের সত্যিকার বিশ্লেষণ দেওয়াই অনেকক্ষেত্রে বিপজ্জনক হ'য়ে পড়ে। রাজনৈতিক স্বার্থোদ্ধারের মারণাস্ত্র হ'য়ে উঠেছে এই ধর্ম। সত্যিকার ধর্মের সন্ধান পেতে যতটুকু কষ্ট স্বীকার করা প্রয়োজন ততটুকু ক'রতে খুব কম লোকই রাজী। এঁদের মধ্যে যারা ধর্মের মূল তথ্য অবগত আছেন তাঁরাও আজ নানা কারণে সন্ত্রস্ত।

ইছলাম ও ইছলামী সমাজ

ইছলাম ও ইছলামী সমাজ পরস্পর নিকট সম্পর্কীয় হওয়া স্বাভাবিক ; কিন্তু কার্য-ক্ষেত্রে অর্থাৎ বর্তমান সমাজে সত্যিকার ইছলামের প্রচলন নেই বললেও বেশী বলা হয় না। সত্যিকার ইছলাম বলতে কুর'আন, হাদীস ও প্রামাণ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থে যে ইছলামের উল্লেখ আছে তাকেই বুঝতে হবে। শেখ শাদী নাকি এককালে বলেছিলেন “মুছলমান গোরে আর মুছলমানী কিতাবে”। কিন্তু শেখ শাদীর জমানার পরে বর্তমান সমাজের মধ্যে ইছলাম কিছুমাত্র স্থান পেয়েছে কিনা অথবা কিছু বিদায় নিয়েছে কিনা সে কথাও একবার আমাদের ভেবে দেখতে

হবে। আমাদের দেশে নূতন কোন শেখ শাদীর জন্ম হবে কিনা জানি না। তবে যদি হয় তবে আমরা তাকে ফাঁসি (?) দেবো কিনা সে কথা এখন বলা যায় না। ফাঁসি দেবার কথা হয়ত আসবে কারণ ইছলামের ধৈর্য্যগুণকে আমরা অর্থাৎ মুছলমানরা হারিয়ে ফেলেছি অনেক আগেই।

ইছলাম বলতে সাধারণতঃ আমরা বুঝি দাড়ি রাখা, লম্বা কুর্ত্তা পরা, রীতিমত নামাজ পড়া, রোজা করা আরও হয়ত কত কিছু ; কিন্তু এসব ছাড়া যে আরও কত বিরাট কর্তব্য র'য়েছে সে কথায় কান দেবার মত সময় আমাদের নেই। ইছলামের মহান ভ্রাতৃবোধ আমাদের মুখের মধ্যেই বাসা বেঁধেছে—অন্তরে নয়। আর সেই কারণেই আমাদের মসজিদের গলিতে আল্লার বান্দা আমাদেরই মুছলমান ভাই না খেতে পেয়ে ম'রে প'ড়ে থাকে, আমাদের মুছলমান বোন অর্দনগ্ন দেহে আমাদের চোখের সামনে ভিক্ষার ঝুলি হাতে ঘুরে বেড়ায় ; কিন্তু তবুও আমরা তাদের দরদী “মুছলমান ভাই” ছাড়া অন্য কিছু নই। আমাদের ছেলেরা যখন তাদের পক্ষে ওকালতি ক'রতে আসে তখন আমরা ছেলেদেরও গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়ে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিতে কস্তুর করি না। তারপর সারারাত তাহাজ্জদের নামাজ পড়ি আর তছব্বিহ্ টিপি। আল্লা যদি এর জন্য আমাদেরকে “জান্নাতুল ফির্দৌসে” জায়গা না দেবেন তবে দেবেন কোথায় ? আমরা যদি বেহেস্তে না যাই তবে যাবে কি বিধমঁরা ? তাই-ই বা কি করে সম্ভব !

শিক্ষা ও সমাজ

এত সব ক'রবার পরেও আমরা জাকাত দিই, দান খয়রাত করি, হজ্জও ক'রে আসি মক্কা শরীফ থেকে, মদিনা শরীফও জিয়ারত করি। সেবারকার আর এবারকার ছুঁভিক্ষের সময় আমরা ধান্ চাল্ প্রভৃতি সস্তাদামে কিনে রাখলাম। তারপর দাম বেড়ে গেল দশ গুণ। কয়েকমাসের মধ্যেই লাভ হ'লো দশ লাখ্ কি তারও বেশী। ভিক্ষের বুলি কাঁধে মুছলমান ভাইরা আর বোনেরা বেরিয়ে প'ড়লো রাস্তায়। মরেও হয়ত গিয়েছিল কয়েক লাখ্ ভাইবোন। তবে জাকাতও দেওয়া হলো আমাদের, দান খয়রাতও হলো, অন্ন-ছত্র খোলাও হলো ছ'একটা, হজ্জটাও ঐ টাকাতে সারা হ'য়ে গেল। সবই ত আমাদের লাভের টাকা। খুদাতা'লা ত আর কিতাবে ব্যবসা ক'রে লাভ করাটা হারাম ক'রে দেননি। আমরা যদি দশ লাখ টাকা লাভ না কর্তাম তবে এত সব হোতো কোথেকে? যারা ম'রে গেছে তারা ত আল্লার হুকুমেই গেছে, আয়ু শেষ হ'য়েছে তাই আল্লার বান্দা আল্লার কাছেই গেছে। ইম্মালিল্লাহ্.....

সেদিন এক চাচাতো ভায়ের ছেলে এসেছিল স্কুলে পড়ার খরচ চাইতে। ছেলেটা খুবই মেধাবী সত্য। পড়াতে পারলে হয়ত দেশের সেরা একজন বৈজ্ঞানিক হ'তে পারতো। কিন্তু নিজের এতগুলি ছেলে মেয়ের পড়ার খরচ যোগাতে হয়। একটা ছেলে তিন্ তিন্ বার কলেজে ফেল্ ক'রেছে। তবুও পাশ্ ত তাকে করাতে হবে। কারণ পাশ্ ক'রতে পারলেই একটা ডেপুটি

শিক্ষা ও সমাজ

ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকুরী পেয়ে যাবে। মেয়েটাকেও বিয়ে দিতে হবে ওপাড়ার খানবাহাদুর সাহেবের ছেলের সঙ্গে। ভাবী জামাতা ব্যারিষ্টারী পাশ্ করে ফিরেছে। বিয়েতে প্রায় দশ হাজার টাকা খরচ হবে। এর পরে কি আর চাচাতো ভায়ের ছেলেকে পড়ার খরচ দেওয়া সম্ভব? নাইবা হোলো সে বৈজ্ঞানিক। গরীবের ছেলে গরীব হয়েই থাকুক। ভিক্ষুকের ছেলে ভিক্ষা করেই দিন কাটিয়ে দিক। ইছলাম এসব ব্যাপারে কি ছবক দিয়েছে তা আমার জানা নেই। আর জেনেও বা আমাদের লাভ কি। বেহেস্তে যাবার ব্যবস্থা যখন সবই করা হয়ে গেছে তখন আর অতশত মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। একটু মনের স্থখে আল্লার নামটা ক'রতে পারলেই বাঁচা যায়। ছুব্‌হানাল্লাহ্.....

বর্তমান ইছলামী সমাজের সত্যিকার রূপ কোন জ্ঞানী ব্যক্তিরই অজানা নেই। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইছলাম আজ ভিন্নরূপে প্রকাশ পেয়েছে; কিন্তু তবুও আমরা তাকে ইছলামী বলে চালিয়ে যেতে চেষ্টা করছি। আমরা যদি মিথ্যা অহঙ্কারকে বর্জন ক'রতে না পারি, সত্যিকার সমস্রাকে যদি আমরা বিচার ক'রে না দেখি তবে সমাজ সংস্কার আমাদের দ্বারা সম্ভব হবে না একথা নিশ্চিতরূপে বলা যায়। আর সমাজ সংস্কারই যদি না হয় তবে আমাদের সৃষ্ট জাতিগঠন-প্রচেষ্টা প্রহসন হবে মাত্র। সমাজের অর্থনৈতিক পরিবর্তন আর কুসংস্কার দূর ক'রতে না পারলে কোন শিক্ষা পরিকল্পনাই কার্যকরী হবে না এবং উপযুক্ত

শিক্ষা ও সমাজ

শিক্ষা ব্যতিরেকে অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও কুসংস্কার দূরীকরণও সম্ভব হবে না। সমস্যাগুলি একটার সঙ্গে আর একটা এত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে কোন একটাকে স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ ক'রলে সমাজ সংস্কার বা জাতিগঠন পরিকল্পনা ব্যর্থ হ'তে বাধ্য।

সংস্কার ও গঠন

সভাসমিতিতে সরকারী প্রচেষ্টার ব্যর্থতার যে অগ্নিময়ী সমালোচনা শোনা যায়, সভাশেষে আবার তা সাদা মেঘের মত বিলীন হ'য়ে যায়। জোর গলায় যাঁরা বক্তৃতা ক'রে সাধারণের করতালি সংগ্রহ করেন তাঁরাই যখন আবার সরকারী গদি দখল করেন তখন পরিণতি প্রায় একই হ'তে দেখা যায়। রাজনীতি-ক্ষেত্রে এসব শোভা পায়; কিন্তু যুগে যুগে যাঁরা সমাজের সংস্কার ক'রে গেছেন, যাঁরা জাতিকে নূতন জীবন দান ক'রেছেন তাঁদের কর্মক্ষেত্র সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁরা নীরবে শুধু কাজই ক'রেছেন, জীবনকে জাতির জন্ম উৎসর্গ ক'রেছেন, মৃত্যু বা শত্রুর রক্ত-চক্ষু দেখে কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হ'তে পারেন নি, সাফল্যের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কোন সংবাদপত্রে তাঁদের নাম ও বক্তৃতা ছাপাও হয়নি। গতানুগতিক পথে অর্থাৎ সবাই যা করে সেই পথে চ'লে জীবনকে হয়ত সহজ ও আরামদায়ক ক'রে তোলা যায় আর একটু বুদ্ধি-সুদৃষ্টি থাকলে দেশে বিদেশে নামও ছড়িয়ে পড়ে; কিন্তু অবহেলিত মানুষদের জন্ম যাঁদের প্রাণে তুষের আগুন জ্ব'লেছে তাঁরা ত এতে শান্তি পাবেন না।

শিক্ষা ও সমাজ

সমাজ ও জাতির সংস্কার ও গঠনকার্যে যঁারা আত্ম-নিয়োগ ক'রতে চান তাঁদের কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে। যঁারা সত্যিকার পথ দেখতে পাচ্ছেন না তাঁদেরকে পথ দেখাতে হবে। দলগত রাজনীতির উর্ধ্বে থেকে সব দলের সঙ্গেই তাঁদের যোগাযোগ রাখতে হবে এবং নিজেদেরও একটা স্বতন্ত্র দল থাকবে। সরকারের ও দেশের জনসাধারণের মধ্যে যোগাযোগ রাখতে হবে এই সেবক দলকে। সেবক দল কোন ব্যক্তির বা কোন পার্টির সমালোচনা থেকে বিরত থাকবে। অন্ততঃ পক্ষে পাঁচজন উপযুক্ত ও নিঃস্বার্থ কর্মী যদি এমন একটা সেবকদল গড়ে তুলতে পারেন তবে আমাদের দেশের, সমাজের ও জাতির সুদিন ফিরে আসবে এরূপ আশা করা অন্যায় হবে না। এই সেবকদলের সর্বপ্রধান কাজ হবে সত্যের প্রচার। তাঁরা প্রচার ক'রবেন সত্যিকার ইছলাম, ন্যায় ও সাম্যনীতি। সমাজের প্রত্যেক ক্ষেত্রের কুসংস্কার, গলদ ও দুর্নীতির সাথে ইছলামের আদর্শের তুলনামূলক সমালোচনা তাঁরা ক'রবেন। দেশের গ্রামে গ্রামে তাঁরা কর্মী বেছে নেবেন। নিজেদের প্রচার-পত্র বা সাময়িক পত্রিকা তাঁরা প্রকাশ ক'রবেন। এমনিভাবে কাজে অগ্রসর হ'লে সরকারও তাঁদের সর্বপ্রকার সাহায্য ক'রতে বিমুখ হবেন না বলে মনে হয়।

এই সংস্কার ও গঠন কার্যে দেশের সাহিত্যিকদেরও একটা বিরাট কর্তব্য রয়েছে। রাজনৈতিক পরিবর্তন দ্বারা কবে কি

হবে সে প্রতীক্ষা না ক'রে সাহিত্যিকরা এগিয়ে আসুন প্রকৃত কর্মক্ষেত্রে। সাহিত্যিকরা লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকেও যে অসাধ্য সাধন ক'রতে পারেন তার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। প্রতিভা না থাকলে সাহিত্যিক হওয়া যায় না এবং প্রতিভাই প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টিধর্মী, যদি সে প্রতিভা বিপথে চালিত না হয়। সত্যিকার সাহিত্যিক যাঁরা, তাঁরা রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের প্রত্যাশী নহেন। রাজনীতিক্ষেত্রে উত্থান ও পতন আছে; কিন্তু সাহিত্যিক ও সমাজসেবীর আসন মানুষের অন্তরেই প্রতিষ্ঠিত।

আমাদের দেশের কোন কোন শ্রেণীর সাহিত্যিক বন্ধুরা সাহিত্যের বাস্তব প্রয়োজনকে অস্বীকার ক'রে কেবলমাত্র ফল-ফুল ও পশু-পক্ষীর জগতে বিচরণ ক'রে তৃপ্তি পেতে চেষ্টা করেন। সাহিত্যিকদের রসবোধ, সৌন্দর্য্যবোধ থাকাও যেমন স্বাভাবিক তেমনি বুভুক্ষ ও মরণাপন্ন মানুষের প্রতি তাঁদের মমতা ও কর্তব্যবোধ থাকাও বাঞ্ছনীয়। প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যিক-রাই জাতিকে পথের সন্ধান দিয়ে থাকেন। জাতির সভ্যতা ও উন্নতির মাপকাঠি সাহিত্য। সাহিত্যকে বাদ দিয়ে কোন দেশে কোন সভ্য জাতি গ'ড়ে উঠেছে কি না তা সঠিক জানা যায় না। সবদিকে দৃষ্টি রেখে, ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধে ও লাভ-লোকমান ভুলে গিয়ে আমাদের দেশের সাহিত্যিকদের এগিয়ে যেতে হবে। রাজনীতিক্ষেত্রে স্বার্থের সংঘাত আছে। তাই সাহিত্যক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব প্রবেশ ক'রতে দিলে জাতীয় ক্ষতির আশঙ্কা থেকে যাবে।

শিক্ষা ও সমাজ

আমার কোন এক সাহিত্যিক বন্ধু একদিন শহরের পতিতালয়ের একটা করুণ ও বাস্তব কাহিনী লেখার সম্ব্যস্ত করেন। তাঁর বর্ণনাও কিছুটা শুনালেন; কিন্তু তাঁকে লিখতে উৎসাহ দেওয়া সম্ভব হ'লো না। কারণ ভদ্র সমাজে পতিতালয়ের কাহিনী শোনানো অভদ্রতার পরিচায়ক এবং আইনতঃ অবৈধ। তাছাড়া কোন সংবাদপত্র-সাময়িকী ও মাসিক পত্রিকা তাঁর লেখা ছাপাতে রাজী হবে কিনা সন্দেহ। যে সমাজে নগ্ন-নারী দেহের ছবি বিক্রী অশোভনীয় নয়, যে সমাজে পতিতার রক্ষণাবেক্ষণ অপরাধ নয়, ঠিক সেই সমাজেই কোন পতিতার আত্ম-কাহিনী, মর্ম-বেদনা ও তার সামাজিক বাধ্যতামূলক তথ্য প্রকাশ করা নাকি ভীষণতম অপরাধ।

পরিকল্পনা

শিক্ষা সংস্কার সম্বন্ধে কোন পরিকল্পনাই সার্থক হবে না, যদি তা ব্যাপক ও সার্বজনীন উদারতা নিয়ে গৃহীত না হয়। কেবলমাত্র কতকগুলি প্রাইমারী স্কুল ও মন্ডলের সংখ্যা বাড়িয়ে বিশেষ কিছু লাভ হবে না।

প্রাইমারী শিক্ষাকে আরও কিছু দীর্ঘ মেয়াদী করা প্রয়োজন। প্রাইমারী শিক্ষা একটা মাত্র নীতির উপর চ'লবে অর্থাৎ ইংরেজী ও আরবীর বগড়া মিটিয়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে শেখানো হবে। প্রাথমিক শিক্ষার দুইটা উদ্দেশ্য থাকবে। প্রথমটা হবে মেধাবী ছাত্রের নির্বাচন আর দ্বিতীয়টা হবে যারা এর পর বেশী লেখা-

শিক্ষা ও সমাজ

পড়া শিখবার সুযোগ পাবে না তাদের জন্ত। তারা পরে টেকনিক্যাল শিক্ষা গ্রহণ ক'রবে। এ ব্যাপারে “সার্জেন্ট প্লান” সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ না ক'রুলেও তার মূল উদ্দেশ্য গ্রহণ করা যেতে পারে। Basic Education Plan এর সঙ্গে মাতৃভাষার মাধ্যমে কিছুটা ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা ক'রে দিলেই Sargent Plan অনেকখানি কার্যকরী হ'তে পারে। আর সিলেবাস তৈরী করাটা তেমন একটা কিছু কঠিন কাজ ব'লে মনে হয় না অবশ্য যদি কর্তৃপক্ষ প্রতিভাবান ব্যক্তিদের পরামর্শ গ্রহণ ক'রতে সম্মত হন। বর্তমান প্রাইমারী শিক্ষায় যেমন শুধু বই পড়ানোই হ'য়ে থাকে সংস্কার পরিকল্পনায় তার একটু ব্যতিক্রম প্রয়োজন।

তারপর সরকার যদি কেবলমাত্র Basic Education-এই কর্তব্য সীমাবদ্ধ করেন তাহ'লেও পরিকল্পনা সুফলপ্রসূ হবে না। প্রতিভাবান ছাত্রদের জন্ত অবৈতনিক উচ্চ-শিক্ষা অথবা যথেষ্ট পরিমাণ বৃত্তিদানের ব্যবস্থা ক'রতে হবে। এক কথায় প্রতিভাবান ছাত্র সে গরীবই হউক আর ধনীই হউক তার তত্ত্বাবধান শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সরকারই ক'রবেন।

তারপর প্রশ্ন আসে Adult Education বা পরিণত বয়স্ক নর-নারীর শিক্ষা। এদের জন্ত বইপড়া ও লেখা ছাড়াও এদের মনের কুসংস্কার দূরীকরণের ব্যবস্থাও ক'রতে হবে। অত্যাধিকার সে সব কুসংস্কার স্বভাবতঃ তাদের ছেলেমেয়েদের শিশুমনের ওপর প্রভাব বিস্তার ক'রে ব'সতে পারে। এজন্য সরকারী প্রচেষ্টা

শিক্ষা ও সমাজ

ছাড়াও জনসাধারণের তরফ থেকে অনেক কিছু আশা করা যায়।

সম্প্রতি যে প্রাথমিক অবৈতনিক শিক্ষার প্রবর্তন করা হ'য়েছে সেটা বাহ্যিক দৃষ্টিতে যতই ভাল মনে হোক না কেন, তাতে বিশেষ সুফল হবে না। তার একমাত্র কারণ প্রাইমারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শতকরা ৮০ জন ছাত্রের কোন ভবিষ্যত নেই। এই শতকরা ৮০ জনের জন্য যে টাকা খরচ হবে সেটাকে অপচয় ব'ললে অত্যাঁয় বলা হবে না। এরা পরবর্তীকালে নাম সহী করা ছাড়া আর কোন উপকার পাবে না। তারপরে যারা মাধ্যমিক শিক্ষার পর্যায়ে আসে তাদের মধ্যেও বেশীরভাগ “না ঘরকা না ঘাটকা” অবস্থায় জীবনপাত করে। তারপর বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও পাশ ক'রে বেরিয়ে এসে অসংখ্য ছাত্র বেকার হ'য়ে ব'সে থাকে। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে সার্জেন্ট প্লানের যে সমালোচনামূলক পুস্তকখানা বের করা হ'য়েছে তাতে এ সম্বন্ধে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য ও মন্তব্য আছে।

বহু পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ে অবিভক্ত ভারতে সার্জেন্ট প্লান তৈরী হ'য়েছিল ; কিন্তু ভারতেও আজ পর্যন্ত তা কার্যকরী করা হয়নি। পাকিস্তানের ও ভারতের কৈফিয়ত একই ব'লে মনে হয়। অর্থাভাবই বোধহয় উভয় দেশের একমাত্র কৈফিয়ত। এই অর্থাভাব দূরীকরণের জন্য সৃষ্টি ও সবল কোন প্রচেষ্টা করা হ'য়েছে ব'লে মনে হয় না। দেশের পাট রপ্তানী ক'রে লক্ষ-পতিরা যে বিরাট টাকা মুনাফা করেন, সেই মুনাফার টাকাটা

শিক্ষা ও সমাজ

যদি সরকারী তহবিলে জমার ব্যবস্থা করা যায় তবে কয়েক কোটি টাকা পাওয়া যেতে পারে। পাটের দাম ক্রমকরা যা পেয়ে থাকে তাতে তাদের চাষের খরচ পোষায় কিনা সন্দেহ। আর যারা শেষ পর্যন্ত বিদেশে পাট রপ্তানী করেন তাঁরা বোধ হয় পাঁচ ছয় গুণ দাম পেয়ে থাকেন। মধ্যকার দালালরাও যথেষ্ট লাভ পান। সরকার যদি পাট নিজ তত্ত্বাবধানে রপ্তানীর ব্যবস্থা করেন এবং ছুঁনীতি বন্ধ ক'রতে পারেন তাহলে দেশের প্রভূত মঙ্গল হ'তে পারে। পাটের মত আরও কতকগুলি ব্যবস্থা যদি অবলম্বন করা হয় তাহ'লে শিক্ষাখাতের জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা সরকারের পক্ষে মোটেই কষ্টসাধ্য হবে না।

ইছলাম ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাখার স্বপক্ষে একথা সত্য। রাশিয়ার মত সবকিছুই জাতীয়করণ নাকি গণতন্ত্রের বিরোধী। তবে বাস্তব-ক্ষেত্রে যখন দেখা যায় যে পুঁজিপতিরা কোটি কোটি টাকা লাভ করেন, তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি জোয়ারের পানির মত কেবল বেড়েই চলে, আর তার ফলে দেশের লক্ষ লক্ষ লোক প্রতি বছর দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর অবস্থায় নেমে যায় তখন ইছলামী বিধান মতেও তার গতি রোধ করা চলে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ব্যবসায়ের মুনাফার একটা সীমা নির্ধারণ করা ইছলামী নীতির পরিপন্থী ব'লে মনে করা ভুল। ইছলামী শাস্ত্রে যাঁরা অভিজ্ঞ তাঁরা যদি সমাজের শোষণনীতির দিকে দৃষ্টি রেখে বৃহত্তর মানব-সমাজের কল্যাণ কামনা করেন তবে তাঁরাও “জাতীয়-করণ” প্রথা অনেকাংশে মেনে নেবেন সন্দেহ নেই।

ইছলাম শিক্ষা দিয়েছে—সম্পত্তির মালিক “আল্লাহ্”। তাই মনে হয় আল্লার এই সম্পত্তিকে মাত্র কয়েকজনে গ্রাস ক’রে ব’সে থাকবে আর বাকী সব তাদের দরজায় ভিক্ষে ক’রে বেঁচে থাকবে নেতা আল্লাতালার অভিপ্রেত হ’তে পারে না।

আমরা যখন ইছলামকেই আমাদের ধর্ম ব’লে মেনে নিয়েছি তখন ইছলামের মূল সাম্যনীতি ও ভ্রাতৃবোধকে অস্বীকার করা অযৌক্তিক। ইছলাম অর্থে শান্তি ; কিন্তু শতকরা ৯০ জন মুছলমানের অধিকার বিনষ্ট ক’রে বাকী কয়জনের শান্তিই আমাদের কাম্য হওয়া উচিত নয়। কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত প্রভৃতির অন্তর্নিহিত মহান্ উদ্দেশ্য যদি প্রতিপালিত না হয় তবে কেবলমাত্র বাহ্যিক অনুষ্ঠান ও প্রদর্শন-স্পৃহা দ্বারা শান্তির প্রতিষ্ঠা কখনই সম্ভব হবে না। ইছলামের মহান নেতা (দঃ) ও তাঁর খলিফাদের (রাঃ) জীবনের আদর্শ আমাদের চলার পথে সহায়ক হ’তে পারে, যদি আমরা অন্তর দিয়ে তাঁদের সকলকেই শ্রদ্ধার চোখে দেখতে শিখি। মৌখিক শ্রদ্ধা ও মৌখিক স্বীকারোক্তি আমাদের মুক্তি পথের সন্ধান দিতে পারবে না একথা সুনিশ্চিত।

ইছলাম একটা সম্পূর্ণ ধর্ম। আমাদের সমাজেও তাঁর সম্পূর্ণ প্রকাশ প্রয়োজন। ইছলামের আংশিক গ্রহণ ও আংশিক বর্জন পবিত্র কুরআনের শিক্ষার বিরোধী। সমাজকে জাগাতে হ’লে, সমাজকে সংস্কার দ্বারা নূতন ক’রে গ’ড়ে তুলতে হ’লে, জাতির

শিক্ষা ও সমাজ

প্রতি কর্তব্য পালন ক'রতে হ'লে ইছলামের পরিপূর্ণ শিক্ষাকে গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই। মানুষের অতি প্রয়োজনীয় বাস্তব অধিকারকে অস্বীকার ক'রে কেবলমাত্র “আত্মাকে” দেখিয়ে দিলে ইছলাম আমাদের ক্ষমা ক'রবে না। “দেহ” আর “আত্মা” নিয়েই যেমন মানুষ “বস্তু” আর “ঈমান” নিয়েই তেমনি ইছলাম। দেহকে বাদ দিলে আত্মার অবস্থান যেমন মহাশূণ্যে, বস্তুকে বাদ দিলে ঈমানের গতিও তেমনি বেহেস্তে। ঈমানের বেলায় স্বার্থত্যাগের প্রশ্ন ওঠে না ; কিন্তু “বস্তুর” সঙ্গে স্বার্থ, মায়া, মোহ, অবিচার, অত্যাচার, শোষণ প্রভৃতি সবকিছুই জড়িত। প্রকৃতপক্ষে মানুষ বস্তুকে সহজে ত্যাগ ক'রতে পারে না এবং সেই জগুই প্রয়োজন হয় ন্যায়নীতি ও নৃক্ষ বিচারের। দুনিয়ায় বেঁচে থাকবার জগু বস্তুই সবার কাছে সবচেয়ে বড়। তাই সবারই বাঁচ'বার অধিকার স্বীকার করা প্রয়োজন, সবারই শিক্ষার প্রয়োজন, সবারই সামাজিক মর্যাদার প্রয়োজন এবং সর্বোপরি সবারই শান্তির প্রয়োজন। সত্যের জয় হবে আর মিথ্যা ধ্বংস হবে ইহা কুর'আনের বাণী। ন্যায়নীতি বেঁচে থাকবে আর অন্যায়ের অবসান ঘটবে ইহাই মহানবীর (দঃ) মহান শিক্ষা।



এই লেখকের অন্যান্য বই

১। শারাবান তহুরা

(ঐশী প্রেমের তত্ত্বমূলক কাব্য গ্রন্থ)

দাম : ১৥০

২। ইনকিলাব (কবিতা)

দাম : ৮/০

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেন :—নবীন কবির ছন্দ ও ভাষার উপর চমৎকার অধিকার আছে। বাস্তবিক তাহা মনোমুগ্ধকর ও কিশ্তিৎ বিদ্যয়জনকও বটে। পারস্যীক কবিদিগের বিশেষতঃ উমর খৈয়ামের ভাবের প্রতিচ্ছবি ইহাতে স্পষ্ট। একরূপ ধরণের মৌলিক কাব্য-গ্রন্থ বাংলা ভাষায় খুবই বিরল।

সুসাহিত্যিক এস, ওয়াজেদ আলি বলেন :—এই কবাইয়াত-গুলি আমি গভীর মনোযোগ ও আনন্দের সহিত পড়িয়াছি। এই গুলির মধ্যে লেখকের উচ্চ শ্রেণীর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে খুব উচ্চ ধরণের মৌলিক চিন্তাধারাও পরিলক্ষিত হয়।

কবি গোলাম মোস্তফা বলেন :—এই ছোট কাব্যখানির মধ্যে এমন একটা ভাবালুতা এবং রসবোধ আছে যাহা পাঠকের অন্তরস্পর্শ না করিয়াই যায় না। রূপক কাব্যের মধ্যে কবির ইঙ্গিত এবং লক্ষ্য কোথায় তাহাই বিচার করিতে হইবে।

এ, কে, ফজলুল হক (এডভোকেট জেনারেল) বলেন :—লেখকের ভাবধারা বাংলাদেশে বিস্তৃতি লাভ করিলে বাংলার মুছলিম সমাজ যথেষ্ট উপকৃত হইবে।

জাତିকে গড়ে তুলতে যাঁরা তাঁদের
 ধনে রাখতে হবে—মহাজের কুপংক্ষার,
 দুর্নীতি, স্বার্থপরতা, কপটতা ও আর্থিক
 শোষণকে প্রতিরোধ করতে না পারলে
 জাতি গড়ে উঠবে না। যাঁরা এপথে
 অগ্রসর হতে চান তাঁরা ওবে দেখুন
 সংঘবদ্ধভাবে ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'য়ে এজন্য
 কতখানি ত্যাগ স্বীকার করতে পারবেন।
 যদি না পারেন তবে প্রকৃতির নির্ধারিত
 বৈশাখাতের প্রতীক্ষা করুন।